International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-II, March 2016, Page No. 01-06
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বৈদিক ও উপনিষদিক দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ

সুজিত কুমার মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বোলপুর কলেজ, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nature of man is a multidimensional phenomenon. In the long history of philosophy, many thinkers have contributed their thought and given attention to the question regarding the nature and the status of man. Some of those thoughts are influenced by psychology and some of them are expressions of metaphysical insight. The Vedic man did not find himself in an alien environment. Man is an integral part of whole of all these bodies and may be interpreted as different levels of reality accepted by the Upanisads. In Indian cultural tradition, the discussion about the nature of man is as old as the Vedas and Upanisads. The cruxes of the philosophical aspects of the Vedas are contained in the Upanisads also, and they are rightly called 'Vedanta', the highest philosophical teachings of the Vedas. In this paper an attempt has been made to analyze the potential divine nature of man.

যে সকল শাস্ত্র মানুষের স্বরূপ ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে নৃ-বিদ্যা, ধর্ম, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ও দর্শন প্রধান। তবে এ ব্যাপারে যথার্থ দিশা দেখাতে পেরেছে দর্শন। মানুষের প্রকৃতি বহুমুখী, দর্শন মানুষের এই বহুমুখী প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছে। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে এক অদম্য স্বাধীনতা, মানুষের এই স্বাধীনতাকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য দর্শন সর্বদা সচেষ্ট।

প্রাণী রাজ্যে মানূষের স্থান কোথায়, বা অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানূষের স্বাতন্ত্র্য কোথায়, তার আলোচনা দর্শনে ইতিহাসে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দর্শনের নানা শাখা-প্রশাখা যেমন- মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনুষ্য প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছে। মনোবিদ্যার দিক থেকে ফ্রয়েড অবচেতন মনের চাহিদা এবং অচেতন মনে লুক্কায়িত ইচ্ছাদির মাধ্যমে মানুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিদ্যার দিক থেকে মানুষ কিভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে সমাজজীবনে উপনীত হয়েছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রকৃতিগত দিক থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজচেতনা কিভাবে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমাজবিদ্যায়। এই প্রবন্ধে মানুষ সম্বন্ধে বৈদিক ও উপনিষদীয় ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করব।

বেদের শেষ ভাগকে বলা হয় বেদান্ত বা উপনিষদ। উপনিষদে মানুষের সুপ্ত প্রকৃতি থেকে ব্যাপ্ত প্রকৃতিতে উত্তরণ লক্ষ করা যায়। ঋকবেদ হল প্রাচীনতম বেদ। ঋকবেদের নানা জায়গায় 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'জীব', প্রভৃতি শব্দ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে এই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। তাই বৈদিক ও উপনিষদিক আলোচনা মূলত জীবকে নিয়েই। জীবের এক দিক আছে দেহ এবং অপরদিকে আছে চেতনা। এই চেতনা আত্মা নামে কথিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য জীব আত্মা হলেও আত্মা মাত্র জীব নয়। শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত আত্মাকে বেদ ও উপনিষদে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই বৈদিক বা উপনিষদিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের ধারণা জানার আগে বেদ ও উপনিষদ মতে এই জগতের আবির্ভাব, ব্রহ্ম, আত্মা,

জীব প্রভৃতি সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা থাকা প্রয়োজন। বেদকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, এই চারটি স্তর হল- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

বেদে প্রথাগত দার্শনিক মতবাদ সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠেনি। দার্শনিক ধ্যান-ধারণা বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিদের কাছে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এই তিনের সমন্বয়ে এক বৈদিক জীবনদর্শন গঠিত হয়েছিল। এই জীবন দর্শনে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্ম, আত্মা, ঋত, ঋণ প্রভৃতি বৈদিক ধ্যান-ধারণা নানা রকম ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সংহিতায় আত্মার ধারণা নানা ভাবে বর্ণনা করা হলেও 'আত্মা' শব্দটির ব্যবহার সংহিতায় বিশেষ দেখা যায় না। প্রাক্-উপনিষদীয় যুগে আত্মার ধারণাও সুনির্দিষ্ট ছিল না। বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বলা যেতে পারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে আত্মা শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। আত্মা বলতে প্রাণ, কখন দেহ, কখন বস্তুর অন্তঃসত্তা, কখন জীবাত্মা আবার কখন আত্মা বলতে পরমাত্মাকে বোঝান হয়েছে। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে মৃত্যুর পরেও জীবন স্বীকার না করলে কর্মের ফলভোগ ব্যাখা করা যায় না। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে। সুতরাং কর্মফল ভোগ করার জন্য আত্মাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নানাভাবে আত্মার কথা বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে আত্মা বুদ্ধি, চেতনা ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। আত্মা হল আলোকস্বরূপ। আকাশ বাতাস সহ অন্যান্য সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর থেকে আত্মা বড়ো। আত্মাকে আবার সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে,[১] এবং তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে আত্মাকে অহং রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

একমাত্র উপনিষদে আত্মার সুস্পষ্ট ধারোণা পাওয়া যায়। তৈত্তরীয় উপনিষদে পঞ্চকোশের মাধ্যমে আত্মার ধারণাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। পঞ্চকোশগুলি হল যথাক্রমে- অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ। এই কোশগুলি বন্ধনস্বরূপ। আত্মা ধীরে ধীরে কোশমুক্ত হয়ে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ হয়। আত্মা কোশাবদ্ধ হয় অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞানের বিনাশ হলেই আত্মা তার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করে। আত্মার এইরকম উপলব্ধিকে মোক্ষ বলা হয়।

ঋগ্‌বেদসংহিতায় 'ব্রহ্ম' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। এটি কখন মন্ত্র অর্থে, কখন প্রার্থনা অর্থে আবার সূক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদে ব্রহ্মকে সবকিছুর উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে- গোষ্ঠে যেমন সকল গো অবস্থান করেন তেমনি সবকিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান।[৩]

সকল দেবতার অধিষ্ঠান হচ্ছেন ব্রহ্ম। উপনিষদে যেভাবে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, বিভিন্ন সংহিতায় সেভাবে পার্থক্য করা হয়নি। ঋক্‌বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে- আমাদের পিতা হচ্ছেন জগৎস্রষ্টা, আমাদের পালয়িতা। তিনিই সকলের জনক, সমগ্র জগতের জনক। তিনিই জগত স্রষ্টা, তিনিই জগতের জ্ঞাতা, তিনিই সকল দেবগণের নাম প্রণেতা। তিনিই সকল দেবগণের নাম-ধামের ব্যবস্থা করেছেন।[৪]

বিভিন্ন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের ধারণা স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে ব্রহ্মই হচ্ছেন বন, ব্রহ্মই হচ্ছেন বৃক্ষ। এই বন এবং বৃক্ষ থেকেই জগৎ নির্মিত হয়েছে। ব্রহ্ম নিজের মধ্যে থেকে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র জগতকে নিজের মধ্যে ধারণা করেছেন। তিনি সমগ্র জগতের নিয়ামক।[৫]

আবার শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মকে সয়ম্ভূ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬] এখানে আরো বলা হয়েছে যে আদিতে ব্রহ্মই ছিলেন, ব্রহ্মই ক্রমে ক্রমে জগত ও দেবতা সৃষ্টি করেছেন।

ব্রহ্মের ধারণা উপনিষদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এক আনন্দময় সত্তা। তিনি। তিনি পরম সত্য, তিনি অনির্বচনীয়। কোনরকম বিশেষণের দ্বারা তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে, মূর্ত এবং অমূর্ত। জগতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মূর্ত ব্রহ্ম। অমূর্ত ব্রহ্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। অমূর্ত ব্রহ্মকে সদর্থক ভাবে জানা যায় না। জাগতিক বস্তুর নিষেধের মাধ্যমে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হয়।

উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় আত্মাকে অজ্ঞেয় রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মা কেন অজ্ঞেয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আত্মা অজ্ঞেয় বলতে আত্মা যে জ্ঞানের বিষয় হতে পরে না, এমন কথা তিনি বলেন নি, তিনি বলেছেন আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অন্যান্য জ্ঞেয় বস্তুকে আলোকিত করে। সেইজন্য আত্মাকে অন্য বিষয়বস্তুর মতো জানতে হয় না। যিনি দর্শন করেন, তিনি সবকিছুকে দর্শন করলেও নিজেকে দর্শন করেন না, যিনি শ্রবণ করেন তিনি সবকিছুকে শ্রবণ করলেও নিজের কথা শোনেন না। তেমনি কখন জ্ঞাতা আত্মজ্ঞানের বিষয় হয় না। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে চক্ষু, মন কোন কিছুই আত্মাকে জানতে পারে না।

বিভিন্ন উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মকে সমার্থক বলা হয়েছে তবুও উওভয়ের মধ্যে ভেদ অপ্রসিদ্ধ নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে আত্মাই বা কি? ব্রহ্মাই বা কি? প্রাচীন মুনী-ঋষিগণ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন এক অদ্বিতীয় সত্তাই জগৎ ও বহুবীজরূপে প্রতিভাত। এক ঐক্যতত্ত্বই উপনিষদগুলির মৌলিক অবদান। এই কারণে আত্মা ও ব্রহ্মকে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে। উপনিষদে ব্রহ্মকে দুই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত- বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠানরূপে, এটি ব্রহ্মের সম্প্রপঞ্চরূপ এবং দ্বিতীয়ত- বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে চরমতত্ত্বরূপে, এটি ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চরূপে। এখান থেকেই অদ্বৈত বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম, আত্মা, জীব

ব্রহ্ম – 'বৃহ' ধাতু থেকে 'ব্রহ্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভামতীকার বলেছেন, "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্বাত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে।"[৭] অর্থাৎ যা বৃহৎ বা দেহ ইত্যাদির পরিমাণ ঘটক আত্মাস্বরূপ, তাই ব্রহ্ম। নিরুক্তকার বলেছেন, "বর্হতি, বৃংহয়তি তদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম।"[৮] অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্তাই হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই বুৎপত্তিগত অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী এক অদ্বয় সত্তা। একদিকে এই সত্তা নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্বিশেষ, অনির্বচনীয়, ভেদরহিত অন্যদিকে স্বপ্রকাশ, সয়ম্ভু, সর্বব্যাপক, সর্বোচ্চ ও সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম ত্রিবিধ ভেদরহিত। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম একমাত্র সৎ ও নিরবয়ব সত্তা। একমাত্র ও নিরবয়ব সত্তার ভেদের কোন প্রশ্নই তোলা যায় না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। জগৎ মিথ্যা হলেও প্রাতিভাসিত হয়। প্রতিভাস সবসময় প্রকাশত্মক। প্রকাশ চৈতন্য সাপেক্ষ। মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ।

বেদান্তে বলা হয় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, এই ব্রহ্মই হচ্ছে আত্মা। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন যিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপ ঈশ্বর, তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্ম। বেদান্ত সাধারণ মানুষের ধারণার বিরোধিতা করেছেন এবং ঈশ্বরের ধারণাকে অবিদ্যপ্রসূত বলে বর্ণনা করেছেন। বেদান্তে ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম অবিদ্যপ্রসূত। অন্যরকম ভাবে বললে, ঈশ্বর হচ্ছেন ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। ঈশ্বর স্বরূপগতভাবে নির্গুণ। বেদান্তে স্বরূপ ও তটস্থ এই দ্বিবিধ লক্ষণের মাধ্যমে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যে লক্ষণ কোন তত্ত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করে, সেই লক্ষণকে বলা যায় স্বরূপ লক্ষণ আর যে লক্ষণ তত্ত্বের আপাত রূপকে প্রকাশ করে, সেই লক্ষণকে বলে তটস্থ লক্ষণ। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে – কোন ব্যক্তি যখন রাজা দশরথের অভিনয় করেন, তখন ঐ ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় যা, সেটি হল তার স্বরূপ লক্ষণ আর অভিনয়ে রাজা দশরথের পরিচয় তটস্থ লক্ষণ। ঈশ্বর ব্রহ্মের এইরূপ তটস্থ লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নির্গুণ, সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব।

আত্মা – আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ করা যায়। চার্বাক দর্শনে দেহ আত্মা, বৌদ্ধ দর্শনে কোন স্থায়ী আত্মা নেই। বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারাই আত্মা। জৈন দর্শনে আত্মা একপ্রকার দ্রব্য, এই দ্রব্য স্থায়ী, চেতন ও দেহপরিমাণ। ন্যায়মতেও একপ্রকার দ্রব্য, এই দ্রব্য সংখ্যায় বহু ও চৈতন্য নামক আগন্তুক ধর্মবিশিষ্ট। মীমাংসা দর্শনে আত্মা চেতন ও সংখ্যায় বহু। বেদান্ত দর্শনে আত্মা এক, অদ্বিতীয়, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।

ন্যায় দর্শনে আত্মত্ব জাতি সিদ্ধির মাধ্যমে পরমাত্মা (ঈশ্বর) ও আত্মাকে এক জাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর ও আত্মা একই জাতীয় হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা এবং

জীবাত্মার অদৃষ্টের পরিচালক। বেদান্তমতে ব্রহ্ম স্বরূপগত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য ও মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। আত্মার সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্মের কোন পার্থক্য নেই। আমরা সাধারণ মানুষেরা আত্মা বলতে জীবাত্মাকেই বুঝে থাকি। প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা ও ঈশ্বর বা পরমত্মার প্রকৃত ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন এবং স্বরূপত স্বপ্রকাশ, নির্গুণ ও শুদ্ধ স্বভাব। এই দর্শনে যা বুদ্ধ, মুক্ত, শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম তাই আত্মা। এই আত্মা অবিদ্যায় উপহিত হয়েই জগতে জীবরূপে পদার্পণ করেন।

জীব – অদ্বৈতবেদান্ত মতে অবিদ্যা প্রসূত এবং উপাধি-উপহিত (সীমিত) আত্মাই জীব। উপাধি উপহিত জীব জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। শুদ্ধ ও মুক্ত আত্মার মধ্যে অনাত্মার অধ্যাসের ফলে 'অহং' রূপ জীবের আবির্ভাব ঘটে। অন্তঃকরণের সঙ্গে যখন সাক্ষী চৈতন্য যুক্ত হয়, তখনই সেটা অহং-য়ে পরিণত হয়। অধ্যাস হল জীবের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, রোগ ও শোকের কারণ। অধ্যাসের ফলে জীব দুঃখ-জর্জরিত বদ্ধ জীবন ভোগ করে। যখন ব্রহ্ম সূক্ষ্ম-শরীর, স্থূল-শরীর, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি এবং মন- এইসব উপাধির দ্বারা উপহিত হন, তখনই তাকে জীব বলে। অতএব ব্রহ্মে বিভিন্ন উপাধির আরোপের ফলে জীবের আবির্ভাব ঘটে। আবার এই আরোপও অবিদ্যা-জনিত। সতেরটি উপাদান যেমন- পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও মন – এগুলির সমন্বয়ে জীবের সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। ব্যষ্টি-অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মা ঐসব উপাধি উপহিত হয়। জীবের দেহ, বর্ণ, জাতি, আয়ু নির্ধারণ করে উপাধিই। অন্তঃকরণ উপহিত হয়ে একই আত্মা বহু জীবে পরিণত হয়। জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অন্তঃকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা। অন্তঃকরণ বলা হয় মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহংকারের সমষ্টিকে। অন্তঃকরণের ভিন্নতার দ্বারাই জীব ভিন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল ভোগের অধিকারি হয়। মৃত্যুর ফলে জীবের স্থূলশরীর বিনষ্ট হয় এবং জীবের সূক্ষ্মশরীর কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন লোকে গমন করে এবং কর্ম অনুযায়ী পুনরায় নতুন স্থূলশরীর গঠন করে, একেই বলে পুনর্জন্ম।

অবিদ্যা সংসার দশায় জীবের ব্রহ্ম-স্বভাবকে আবৃত করে রাখে। ফলে জীব নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে। তখন জীব নিজে আমি ধনী, আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি বোধের অধিকারী হয়। অবিদ্যার কিন্তু বিনাশ আছে। অবিদ্যা বিনাশ হয় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা। অবিদ্যার বিনাশ ঘটলে জীব স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যবহারিক। ব্যবহারিক দিক থেকে জীব ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক করে জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে জীব ব্রহ্মস্বরূপ। অবিদ্যা-উপহিত ব্রহ্মই হল জীব। তাই জীব ব্রহ্মের সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই।

বিভিন্ন উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই অভিন্নতার কথা উদ্বৃত করে অদ্বৈতবেদান্তে জীব ও বহ্মের পারমার্থিক অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন উপনিষদে চারটি মহাকাব্যের পরিচয় পাই। এই চারটি মহাকাব্যে হল- **তত্ত্বমসি** (ছান্দোক্যপনিষদ ৬।৮।৭), **অহং ব্রহ্মস্মি** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১০), **প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম** (ঐতরেয় উপনিষদ ৩।১।৩) এবং **অয়মাত্মা ব্রহ্ম** (মাড়ুক্য উপনিষদ, ২) উপনিষদের এই সকল মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হল জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এখন আমরা অভেদ প্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' মহাকাব্যের তাৎপর্য অদ্বৈতবেদান্তীরা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করবো। তত্ত্বমসি মহাকাব্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম এবং 'তং' শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। শঙ্করের মতে 'তৎ' ও 'ত্বং' অভিন্ন। এই অভিন্নতা তিন রকম ভাবে দেখানো যায়- প্রথমত সামানাধিকারণ্য, দ্বিতীয়ত বিশেষ্য-বিশেষ্যণভাব এবং তৃতীয়ত লক্ষণার সাহায্যে। এই তিন রকম অভিন্নতার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল—

সামানাধিকরণ্য – 'এই সেই দেবদত্ত' – এই বাক্যের মধ্যে 'এই' এবং 'সেই' শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থবোধক হয়েও একই অধিকরণ দেবদত্তকে নির্দেশ করছে। তেমনি 'তৎ' এবং 'ত্বং' শব্দদুটি ভিন্ন অর্থ হয়েও একই পর্দায় ব্রহ্মকে নির্দেশ করছে।

বিশেষ্য-বিশেষণভাব – 'তৎ' এবং 'ত্বং' এই শব্দদুটিকে বিশেষ্য-বিশেষণভাবে গ্রহণ করেও তারা যে অভিন্ন সেটা দেখানো যায়। 'শ্বেতপদ্মে'র জ্ঞানে 'শ্বেত' শব্দটি বিশেষণবোধক ও 'পদ্ম' শব্দটি বিশেশ্যবোধক। 'শ্বেত' এবং 'পদ্ম' এই দুটি শব্দের

অর্থ ভিন্ন হলেও এই শব্দদুটি একটি পদার্থকেই নির্দেশ করছে। নানা রঙের পদ্ম হতে পারে, কিন্তু শ্বেতপদ্ম একই রকম হবে। 'তৎ' এবং 'ত্বং' শব্দদুটি একে অপরের বিশেষণ-বিশেষণ রূপে এক ও অখণ্ড চৈতন্যকে প্রকাশ করছে।

লক্ষণা – বাক্যের মুখ্য অর্থকে পরিত্যাগ না করে, সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থকে পরিত্যাগ করে তাৎপর্য অনুধাবন করে গৌণ অর্থ গ্রহণকে লক্ষণা বলে। লক্ষণা তিন প্রকার- জহৎ লক্ষণা, অজহৎ লক্ষণা, জহদজৎ লক্ষণা। জহৎ লক্ষণার ক্ষেত্রে বাক্যের মুখ্য অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়। অজহদ লক্ষণার ক্ষেত্রে বাক্যের মুখ্য অর্থকে অক্ষুন্ন রেখে অন্য যোগ করা হয়। জহদজহৎ লক্ষণার ক্ষেত্রে বাক্যের মুখ্য অর্থের আংশিক ত্যাগ এবং আংশিক গ্রহণ করা হয়। জহদহজৎ লক্ষণার দ্বারা 'তৎ' এবং 'ত্বং' – শব্দের অভেদ প্রতিপাদন করা হয়। 'তৎ' পরোক্ষ চৈতন্য কিন্তু 'ত্বং' অপরোক্ষ চৈতন্য। পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব একে অপরের বিরুদ্ধে, কিন্তু চৈতন্যের অংশে উভয়ে অবিরুদ্ধ। বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করে অবিরুদ্ধাংশে উভয়ের ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। চৈতন্যাংশই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের তাৎপর্য। অদ্বৈতবেদান্তীরা সামানাধিকরণ্য ও বিশেষ্য-বিশেষণভাব পরিত্যাগ করে জহদজহৎ লক্ষণার দ্বারাই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের তাৎপর্যকে গ্রহণ করেছেন। অপর তিনটি মহাবাক্যেও অনুরূপভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ঘোষনা করে।[৯]

তথ্যসূত্র

১। "সর্বং-হি অহং আত্মা" শঃ ব্রা-৪।২।২।১ ।
২। "তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণঃ আত্মানং বেদ অহং অস্মীতি" ৩।১০।১১।১ ।
৩। "তস্মাৎ বৈবিদ্বান পুরুষম্ ইদম্ ব্রহ্মেতি মন্যতে। সর্বাহি, অস্মিন্ দেবতা গাবোগোষ্ঠ ইবাসতে।" অথর্ববেদ-১১।৪।৩২ ।
৪। "যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তৎ সং প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা। ঋক্‌বেদ-১০।৮২।৩ ।
৫। "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠতুক্ষুঃ মণীষীণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্রহ্মাধ্যাতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারনম্।"
৬। শ; ব্রাঃ- ১০।৬।৫।৯ ।
৭। মহামহোপাধ্যায়-বাচস্পতি-মিশ্র-বিরচিত-ভাষ্যটীকা ভামতী, বেদান্ত-দর্শনম্, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুদিত এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, প্রথম ভাগ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠ-৬ থেকে উদ্বৃত।
৮। প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, ভারতীয় দর্শন, পৃষ্ঠা- ২৯৫ থেকে উদ্বৃত।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩০৩-০৪।

গ্রন্থপঞ্জী

১। উপনিষদ, অতুলচন্দ্র সেন কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২।
২। ঘোষ, কাকলি, ভারতীয় দর্শনে সত্তার ধারণা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।
৩। ঘটক, পঞ্চানন, সাংখ্যদর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭।
৪। চক্রবর্তী, নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১০।
৫। চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র চন্দ্র, সাংখ্য-কলিকা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪।
৬। ভট্টাচার্য, রজত, সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১।
৭। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার : প্রশস্তপাদের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১২।
: ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১০।
: বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।
৮। Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy(Vol. I-V), Cambridge University Press, 1969.

৯। Bhattacharyya, Kalidas, Edited: Philosophical Papers, Centre of Advanced Study in Philosophy, Visva-Bharati, Santiniketan, 1969.

: The Indian Concept of Man, Hirendranath Dutta Foundation, Jadavpur University, Calcutta, 1982.

১০। Lal, B. K, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2002.

১১। Mukhopadhyay, P.K., The Nyāya Theory Of Linguistic Performance, Jadavpur University, 1991.